দেশবন্ধুর-বজ্রবাণী

"—তোমার মন্ত্রবাণীর স্পর্শ হানিবে সকল-বন্ধন।
দীপ্ত আননখানির-আদর্শ আনিবে মুক্তনন্দন!
তোমার পাঞ্চজন্য বাজাব আমরা মুক্তি-পন্থ,
জয় সুন্দর সত্যযাত্রী! জয় চির-বিজয়ন্ত!—"

(শিবরাম)

"পঠিতব্যা স্মর্ত্তব্যাচ
নায়কস্য বাণী সদা।
দেশবন্ধোর্মুখপদ্মাৎ
'বজ্রবাণী' বিঘোষিতা॥"

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্তিস্থান—প্রবাসী কার্য্যালয়—৯১ নং আপার সার্কুলার
রোড, কলিকাতা, এবং সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান
বইয়ের-দোকান ও বুকষ্টল।

মূল্য আট আনা

প্রকাশক
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
অন্নদা-পাব্লিশিং হাউস্
৫৫নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস
৯১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

—ওঁ মা—

স্মৃতিপূজা

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

গীতা যাঁহারা মানেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য যে দেশবন্ধুর জীবনে গীতার গুরুর এই মহাবাক্য সার্থক হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রের বেদান্ত দর্শনের "মুক্তস্য ব্রহ্মনোঽভিন্নত্বম্" হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীর "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" পর্য্যন্ত বহু মন্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবতার যিশুও অদ্বৈত-ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন "He abideth in us by the Spirit which He hath given us." ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ বলিয়াছিলেন "আনলহক্" (He and I are all-one!) এই ধর্ম্মের উক্তিতে আরো আছে "নহ্‌লু আকরবো এলাহি মিনহাবিল ওয়ারিদ; আন ফুসিকুম।" (God is nearest of all to thee, He is in thee.) তত্ত্বজ্ঞানী শমন তাব্রেজ বলেছিলেন "আঁহাকে তলব্‌গার খোদায়েম্ খোদায়েম্। বেরুনে শুনামেস্ত শুনায়েদ্ শুনায়েদ্ ॥" (God Seeker! know, God is not out-side, He is within, thou art He!) এইরূপে সর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আমরা গূঢ়সত্য এই পাই যে জগতস্থ জীব এবং যাবতীয় সৃষ্টবস্তু, এক ভগবানেরই বিভিন্ন ক্রীড়াপুত্তলিকা। আমাদের এই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও সেই বিশ্বচিত্তরঞ্জনের খেলার প্রধান অবলম্বনরূপে জগতে অসাধারণ বিচিত্র খেলা খেলিয়া জগৎ ও জগৎ-বাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—যার জন্য আজ দেশবন্ধুরূপে আপামর

সকলের হৃদয়াসনে তাঁর স্থান। তাঁহার ভিতর যে আত্মশক্তির অনন্য-সাধারণ বিকাশ হইয়াছিল তাহা জীবনে বহুবার উপলব্ধি করিয়াছি। সংক্ষেপে একটিবারের কথা উল্লেখ করিতেছি—হরিশপার্কের বস্ত্রযজ্ঞ-সভায় তাঁহার বিশ্বচিত্তাকর্ষক আহ্বানে আত্মহারা হইয়া অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় বিলাতী ও অর্দ্ধবিলাতী সমুদয় পরিধেয় হোমানলে আহুতি দিয়াছিলাম। কলিকাতার বাসায় কি করিয়া ফিরিয়া আসিব তার জ্ঞান ছিল না। রাত্রি ৯টার পর সভাভঙ্গ হইলে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সে রাত্রে আরো অনেক সভায় যোগ দিয়া তাঁর বাড়ী ফিরিতে ১২টা বাজিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে একখানা নূতন খদ্দর আনিয়া অশেষ আশীর্ব্বাদের সহিত আমায় দিলেন। সেদিন তাঁহার মধুর সম্ভাষণে ও অমিয়স্পর্শে প্রাণে কি'যে উদ্দীপনা জাগিয়াছিল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না।—

আজ তিনি নাই—আছে তাঁর স্মৃতি—কাণে বাজিতেছে তাঁহার মর্ম্মান্তস্পর্শী বাণী—প্রাণে জাগিতেছে অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধা!

তাই আজ তাঁর স্মৃতিপূজায় তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক অমর আত্মার উদ্দেশে, তাঁহারই বাগানের কুড়ানো-ফুল '**বজ্রবাণী**' উৎসর্গ করিয়া জানাইতেছি—

ওগো দেশবন্ধু, প্রাণবন্ধু! দেবতা-বাংলার!
তোমার ধন তোমায় দিয়ে করি নমস্কার।

—**উমেশ**—

নিবেদন

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এসবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

যিনি পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্ত্র সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁর শেষ নিশ্বাস বায়ু দেশ ও দশের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেই বিশ্ব-চিত্তরঞ্জনের মৃতসঞ্জীবনী বাণী দেশপ্রেমিক মাত্রেরই প্রাণে মহাজাগরণের তুফান ছুটাইয়া প্রত্যেককেই তাঁহার আরব্ধ এবং ইপ্সিত কর্ম্মযজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও সদস্যের কোন না কোন পদে বৃত করিবে,—এই দৃঢ় বিশ্বাসে ৺দেশবন্ধুর কতিপয় বাণী ক্ষুদ্র পুস্তিকা রূপে গ্রথিত করিলাম। দেশবন্ধুর বাণী পঠন, স্মরণ, মনন দ্বারা যদি কাহারো তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্মান প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য জন্মে, তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। এই বাণী সংগ্রহে বিভিন্ন বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র এবং তৎসম্বলিত প্রকাশিত পুস্তকাদিই আমার প্রধান অবলম্বন। এজন্য আমি তৎসমুদয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। 'বজ্রবাণী' মুদ্রনে আমি যে-কোনরূপে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

মুগা, ময়মনসিংহ।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সন।

নিবেদক—শ্রীউমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র

চিত্র-



সশক্তিক দেশবন্ধু

১ম পৃঃ

বজ্রবাণী

১। বীরেন্দ্র-বাসনা—*

"আমি চাহি না শিষ্ট, চাহি না শান্ত,
চাহি না নিরীহ মেষ।
আমি চাহি যে রুদ্র, চাহি যে চণ্ড,
চাহি যে বীরেন্দ্র বেশ।
আমি চাহিনা রুগ্ন, চাহিনা জীর্ণ,
চাহিনা বিদ্বান্ বোদ্ধা।
আমি চাহি যে হৃষ্ট, বিশিষ্ট পুষ্ট,
চাহি যে সাহসী যোদ্ধা।
আমি চাহি না মিনতি, কৃপাও বিনতি,
চাহি না অশ্রু জল;
আমি চাহি শুধু, দম্ভ, গর্ব্ব,
চাহি হৃদয়ের বল।
আমি চাহি না যে বাবু (সে যে নেহাৎ কাবু)
চাহি না যে আমি খাসা;
আমি চাহি শুধু, তেজস্বী সরল,
মুটিয়া মজুর চাষা।

---

* এই কবিতাটী দেশবন্ধুর স্বরচিত নহে তবে বড়ই প্রিয়। তাঁহারই প্রাণের আকাঙ্ক্ষার অনুকরণে অপরের দ্বারা রচিত।

আমি চাহি না সভ্যতা (ভণ্ডামীর কথা)
চাহি না সুন্দর বেশ ;
আমি চাহি শুধু, এই অধিকার,
ভারত আমার দেশ,
আমি চাহি না দর্শন, চাহি না কাব্য,
চাহি শুধু আমি এই,
ভারতবর্ষ ভারতবাসীর ;
পর অধিকার নেই।”

২। বাংলা ও বাঙ্গালী—

[১]

“অতুলনীয়া বাঙ্গালা আমার বাঙ্গলার কত মধুর রূপ ! এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গলার রূপের কি তুলনা আছে ! শ্যামচেলাঞ্চলময়ী বনরাজি বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছাসময়ী ভাগীরথী মার বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দামউচ্ছল মহোর্শ্মিবিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্তমুখরিত হল্‌হলা, শিরে নগাধিরাজধূর্জ্জটী, সূর্য্য কিরণে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার একহাতে ধান্য শীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম ; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণ রবি হিরণচূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিত কণ্ঠে পিক-কুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে। এ রূপের কি তুলনা আছে !” * * *

“বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবাহমান কাল যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত তাহাতে

অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের ধারা তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবনগৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞান দাসের গান, লোচনদাসের গান সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমি মজিলাম। বুঝিলাম কেন ইংরেজ এদেশে আসিল, বুঝিলাম রাম-মোহনের তপস্থার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে॥"

[২]

"সেই বাঙ্গালা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ; সে বাঙ্গালী যে আজও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয় সেই আনন্দে আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চনমণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি। বাঙ্গালা ভুলিয়া, বাঙ্গালার

ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। ইউ-রোপীয় ভাবের ধারার ছাঁচে নিজেদেরে না ঢালিয়া, আমরা যেন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে, আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন-ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প ও কল্পনাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে সুচিভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ বাঙ্গলার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম। সেই পদ্মালয়, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী, রুধিরার্দ্রবসনা করালী—আর দেখিলাম মদনমোহন

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

মনুষ্য জীবনের যে চরম পরিচয় তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়।"

[৩]

"বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র সেন, কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়! বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গলার একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে

প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট-রূপের প্রাণ।”

[৪]

“আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি। আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

[৫]

“আমি বাঙ্গালী হইয়া জন্মিব মরিব—আবার জন্মিব—আবার মরিব—আমার আর অন্য সাধ কামনা নাই।”

[৬]

“আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলা-চঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। ‘মাৎস্য ন্যায়ের’ অরাজকতার যুগে বাঙ্গালা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গালা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গলা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই, কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গলার স্বভাব ধর্ম্ম, যে প্রাণ মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই (ঢাকা) নগরোপান্তে সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই

প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি পদ্মাগঙ্গার লীলাস্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।”

[৭]

“বাঙ্গালী যে অমানুষ তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না।”

[৮]

“আমার বাঙ্গলাকে আমি সব চাইতে বেশী ভালবাসি। এ বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস। ইতিহাস পড়—বাঙ্গলাকে জানিবার চেষ্টা কর। যেখানেই থাক, আর যাই কর—এই বাঙ্গলাকে ভালবাসিও।”

[৯]

“বাঙ্গালার কৃষক সমস্তদিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের দেশের কাজ শেষ করিয়া দিবাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী মাথা নত কর; ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক, প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও।”

[১০]

“কোথায় বাঙ্গালার আত্মা জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল—আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচিব।”

[১১]

"আবার এমন একদিন আসিবে, যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীজাতি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, একটা জাতি বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি।"

[১২]

"পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমরা আজ নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনইত আমরা ছিলাম না। সবইত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, কটির লজ্জানিবারণ—আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করতাম। আলিপনা দেওয়া আঙ্গিনা, মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, পরস্পরের প্রীতি সবইত আমাদের ছিল। আজ ঘরে লক্ষ্মী নাই, তাই আমরা লক্ষ্মী ছাড়া—কেন আমরা লক্ষ্মী ছাড়া হইলাম? দোষ আমাদেরই—সব দোষ কি আমাদের? ইতিহাস নিজকৃত দোষকে কখনও ত্যাগ করে না; তবে প্রবলের সংঘাতে দুর্ব্বলের দোষ শত গুণে বাড়িয়া যায়। আমাদের সেই সময়কার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাসে তপ্ত ও সিক্ত, সে কথার বিচার করিয়া কাজ নাই, বিচার করিলেই গরল উঠিবে। আজ মিলনের দিনে সেকথা ভোলাই ভাল। ছিল একদিন বাংলা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। সে বসন ও বৈভব জগতের নরনারীর সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাদান ছিল। ইংরাজ আমলের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে বাংলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল।... সেই দূর শতাব্দীর অন্ধকারে যখন চোখ ফিরাইয়া দেখি—সকলই বিভীষিকাময়, ভয় হয়, মনে হয় সে কি স্বপ্ন! আমরা বাস্তবিকই

মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলাম, দাবী করিবার কিছুই ছিল না, শুধু প্রাণের দাবী ছিল। হায় দুর্ভাগা বাঙ্গালী,…আমরা ঘরের লক্ষ্মীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম! আমরা যে অক্ষম—তাই দোষ কারো নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা 'স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিলাম'। অনাচারে অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায়, আমাদের গৃহধর্ম্মকে, আমাদের স্বভাব ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলাম।"

[১৩]

"আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সুখ দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু সুখের মোহ, আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ।"

[১৪]

"এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধিলাভ করিবে না। যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান আমাদের এই কার্য্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। যাহারা বর্ত্তমান বাংলার চারি কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে,—যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্ম্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে, সরল প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়,

মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থণা করে,—যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে, আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায্য ভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাংলা দেশের একাধারে রক্ত, মাংস ও প্রাণ তাহারা বড় কি আমরা বড় ? কোন সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দেই ? এত অহঙ্কার কিসের ? এত দাম্ভিকতা কেন ? আমরা যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফলন করি, আমরা যে দিনে দিনে হিন্দু ধর্ম্মের যা মর্ম্মস্থান সেইখানে ছুরিকাঘাত করিতেছি। 'ওঠ, ডাক, জাগ'—তাহাদেরই মধ্যে নর নারায়ণ জাগ্রত হউক !"

[১৫]

"বাঙ্গালার দুঃখ মোচনকর, সন্তানের কার্য্যকর—অগ্রসর হও সমবেত চেষ্টায়, সকলের উদ্যমে, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ করিয়া, সকল বিদ্বেষ সকল স্বর্থে আহুতি দিয়া, শুদ্ধ পবিত্র প্রাণে জীবনযজ্ঞ আরম্ভ কর।"

[১৬]

"'মেরেছ কলসীর কাণা তা বলে কি প্রেম দিব না ?' এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন এক রকম রসে উছলিয়া উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি। বাংলা দেশের সঙ্গে আর কোনও দেশের তুলনা হয় না। বাংলা

দেশে শ্রীচৈতন্য জন্ম গ্রহণ করে যে সভ্যতা ও culture দিয়ে গেছেন —তা আমার বিশ্বাস সব দেশকে নিতে হবে। আমরা সেটা ঠিক্ গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে আর কিছু আবশ্যক হবে না। গৌরাঙ্গের জীবন পাঠ করে আমি প্রাণে একটা সাড়া পেয়েছিলাম। বর্ত্তমান কালের artificial life কিম্বা artificial religion আমাকে বিন্দু মাত্র তৃপ্তি দিতে পারে না। বাংলা দেশকে বুঝ্‌তে হলে গৌরাঙ্গ ছাড়া বুঝা যায় না। গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব জীবন ও সাধনা এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী গান আমাকে নূতন আলো দেখায়েছে। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছে গৌরাঙ্গ। সঙ্গ দোষে জীবনে নানা রকম দোষ আমার ঘটেছে, কিন্তু গৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্ত্তি আমার সব সংস্কার, সব দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। মহাপ্রেমের মহাভাবের কি পরিপূর্ণ আদর্শ!”

[১৭]

“ভাব লইয়া আমরা খেলা করি, আদর্শ লইয়া নৃত্য করি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হইতে উপাধ্যায় এমন কি মহাত্মাজীর দ্বারা কম ভাব প্রচার হইয়াছে? কিন্তু ভাব লইয়া কি হইয়াছে? জীবন-ক্ষেত্রে কাহারও বড় সাড়া নাই—ভাব লইয়া ঝিমাইতেছি বা সখ করিতেছি, ইহাতে কিছু হইবে না।”

[১৮]

“যাহা স্বভাবতঃ সরল সহজ তাহাকে মিছামিছি জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না। দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গলার কথা ভাবি না।”

[১৯]

“শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ আমাদের বাংলা। সেখানে ত্যাগের

আদর্শ আমরা ভুলিয়াছি এত বড় অন্যায় অভিযোগ, বাঙ্গালী আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আজ হইতে আমি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিলাম।.........মহাত্মাজীকে আমার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই দেশের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলেন, মানুষ চাই, অর্থ চাই না। মানুষ থাকিলে অর্থ আপনিই আসিবে। সর্ব্বতোভাবে দেশের জন্য ব্রতী হইয়া একবার দেখিব কতদিন এই দাসত্ব বন্ধন থাকে!"

[২০]

"এইরকম যুবকই আমি চাই যারা অন্ধ বিশ্বাসের বশে আমার কাছে আসে নাই। শত্রুভাবে বিচার করিয়া সত্যের সন্ধান যেরূপ অকাট্য হয়, মিত্র ভাবে কার্য্য করিয়া গেলে সব সময় সেরূপ হয় না।"

[২১]

"শত প্রকারের বিবোধ বাদ বিসম্বাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়।"

[২২]

"সকল দেশেই একটা ভাল কায আরম্ভ করিলে দেশের লোক প্রথমে গালাগাল দিতে আরম্ভ করে। যে যুগে কাযটা আরম্ভ হয়, সে যুগে লোক কেবল গালাগালিই দেয়, কিন্তু তার এপ্রিসিয়েশন হয় পরের যুগে।"

[২৩]

"বাধা-বিঘ্ন ছাড়া কোন কার্য্যই জাগ্রত হইয়া উঠে না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর এত অযথা আক্রমণে মাঝে মাঝে মনটা বড় দমিয়া যায়, দেশত আমার নিজের নয়।"

[২৪]

"মহাত্মার ত কোন শত্রু নাই, আমার এত শত্রু কেন? আমি এখন বুঝিয়াছি মহাত্মার মনে হিংসা নাই, তাই তাঁহাকে কেউ হিংসা করে না। আমার মনে নিশ্চয়ই হিংসা আছে তাই আমার এত শত্রু?"

[২৫]

"প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না; মানুষ জন্মায় সেত হিসাব করিয়া জন্মায় না; না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলেই সে একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে।"

[২৬]

"পতঙ্গ যখন উড়িয়া আগুনের কাছে যায় সেত মনে করে না আগুন তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিবে। সেইরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আসিতে হয় এমন যার হয়েছে, তার দ্বারাই কায হবে।"

[২৭]

"আমি কেন এত আশান্বিত। আমি Civil-disobedience কর্‌তেও ভয় পাই না। আমার একদল এমন সংযত, সুগঠিত ও স্বার্থ-শূন্য কর্ম্মী আছে যে, আমার কথায় তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে পারে। তাহাদের বলেই আমি পরাজয় জানি না, হার আমার নাই।"

[২৮]

"বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী না হইতে পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই। পৃথিবীর এই মহা প্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া

যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দির সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। ইহা পলাশী প্রান্তরে বিশ্বাস ঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইভের পদাঘাত ও নয়। আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোণিত পিচ্ছিল।"

[২৯]

"বাঙ্গালার উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে আমি বলি—তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এযুগে বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ, বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—তোমাদের উপর রাজরোষ সংহারের মূর্ত্তিতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আইসে নাই, যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার, যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কোলাহল মুখরিত। যাও বীর যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তুমি, তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, একটা সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত শান্ত পক্ষাপক্ষ সে শান্তিময় মিলন মন্দিরে সমুন্নত শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে,—এই স্বপ্ন সাশ্রু নয়নে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি।"

[৩০]

"আমলা-তন্ত্র তুমি বলিবে, দমন আইনের ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের অবসান হইয়াছিল। তুমি কি ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর? তবে অনেক পুরাতন রাজবন্দী '৩' রেগুলেশন অনুসারে আবার কেন গ্রেপ্তার হইলেন? তবে কি গ্রেপ্তার ভুল ক্রমে হইয়াছে, না তোমার কথাটাই ভুল? আমার কথা এই,

বিপ্লব আন্দোলন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও ইহার অবশান হয় নাই, এখনও বর্ত্তমান আছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তোমরা জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এ আন্দোলন জীবিত থাকিবে।”

[৩১]

“স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনেও প্রাণে দেশের জন্য কাজে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। [তীর্থ সমারোহে, বন্যাপীড়নে, দুর্ভিক্ষে, মহামারির করাল গ্রাসে ইত্যাদি বহু কার্য্যে প্রমাণিত এবং গভর্ণমেণ্ট দ্বারাও পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত।] এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা বা সেই নৈরাশ্যের ফল!”

[৩২]

“যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় জাতীয়তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করা নিরাপদ নয়। আমি লর্ড লিটনকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে দমন মূলক আইনের ফলে এই শিশু জাতিয়তা ক্রমশ বাড়িয়াই উঠিবে। লর্ড কার্জ্জনের মত লর্ড লিটনও বঙ্গে জাতীয়তাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।”

[৩৩]

“দেশের মুক্তি কামনাও যদি বিপ্লববাদ হয়, তবে সে বিপ্লববাদ প্রশমন করিতে হইলে দমন নীতি নহে—চাই স্বাধীনতা, স্বরাজ-

স্বায়ত্ত শাসন। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই দমন নীতিও তোমরা এতদিন চালাইয়া আসিতেছ, কিন্তু তাহাতে এ জাগরণ স্পৃহা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কোন দিন দলিত করিতে পারিয়াছ কি? পারিয়াছ কি কোন দিন বাঙ্গালীকে জাতীয় আন্দোলন হইতে পশ্চাৎপদ করিতে?…কি প্রমাণে তোমরা বিপ্লববাদের নিদর্শন দেখাইতে চাও? ৫৪ খানা বাড়ী ওলট পালট করিয়া তোমরা লইয়া গিয়াছ কি?—না দু'চার খানা বোলশেভিকদের ইতিহাসাবলী। বোলশেভিকদের ইতিহাস কি বাঙ্গালার বিপ্লববাদের নিদর্শন? যাহাদের সহিত আজ তোমরা সখ্যতা ও সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাদের ইতিহাস পাঠ করিলেই কি অমনি বিপ্লব জাগিয়া উঠিবে? তোমরা যাহাদের সহিত মিতালী করিতেছ, তাহাদের ইতিহাস পাঠ করাও কি আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? আর এই যে সারা বাঙ্গালা দেশটা তন্ন তন্ন করিয়া ৭০ জনকে বিপ্লববাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছ—যদি এদেশে প্রকৃত বিপ্লববাদই থাকে, তাহা হইলে এই ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করিলেই কি তাহা প্রশমিত হইবে?……দেশের মুক্তি কামনা যদি বিপ্লববাদ হয় তাহা হইলে সে বিপ্লববাদী নয় কে? আমি নিজেও তাহা হইলে একজন বিপ্লববাদী—!"

[৩৪]

"ব্রাহ্মণ সভা বলিয়াছেন, আমি হিন্দু নই, হিন্দুর ধর্ম্মান্দোলনভার পরিচালন করিবার অধিকার আমার নাই। আমি বলিব আমার হিন্দুত্ব মারে কে? যাঁহারা আজ হিন্দুত্বের, ব্রাহ্মণত্বের বাজে বড়াই করেন, কই তাঁহারা ত এই আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই? এ আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ ত তাঁহারা পাইয়াছিলেন! তবে কেন

হিন্দুত্বের গৌরব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে তারকেশ্বরে গিয়া আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন নাই? আমি যে হিন্দু আজ তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন, তাঁহারা আজ তীর্থ স্থানকে অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে শাস্তি বরণ করিবেন, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি বরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।...আজ ব্রাহ্মণসভা বা যে কোন হিন্দু প্রতিষ্ঠান এ আন্দোলনের ভার গ্রহণ করুন, আমি স্যানন্দে তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কাজ করিব, এবং তাঁহাদের আদেশ পাইলে স্বয়ং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আত্ম সমর্পণ করিব।...... বাঙ্গালী সভ্যতা ও সাধনার ভিতর যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, সে সমস্তের উপর অন্য কাহারও অপেক্ষা আমার কম সহানুভূতি নাই। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জীবন্ত সত্য।......

বাঙ্গালার লর্ড লিটন কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, সত্যাগ্রহকে বিদ্রূপ করিয়া অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এমন অযোগ্য শাসন কর্ত্তা সসম্মানে লাট গিরি হইতে অবসর গ্রহণ করুন।

—আর হিন্দু! তোমরা যদি লাটের এ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তির অহঙ্কারিতা আত্মম্ভরিতার প্রকৃত উত্তর দিতে চাও ত দলে দলে যাইয়া তারকেশ্বরে গ্রেপ্তার বরণ কর, দেখাইয়া দাও বাঙ্গলার অযোগ্যশাসককে যে এ আন্দোলন Colossal hoax নহে, বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর তথা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণের আন্দোলন।"

[৩৫]

"নিজের ছেলে ঘরে থাকিতে পরের ছেলেকে জেলে যেতে বলিতে পারিব না। বাঙ্গালার যুবককে ডাকিবার পূর্ব্বে আমার ছেলেকে সর্ব্বাগ্রে পাঠান চাই।"

[৩৬]

"আমি আশাকরি বাঙ্গালী আজ জাগিয়াছে—ধর্ম্মের উপর অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, বাঙ্গালী আর সহ্য করিবে না। এখনও যদি না জাগিয়া থাক—তবে এমন একদিন আসিবে যেদিন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। যদি আপনারা আমায় আদেশ করেন তবে আমি নিজে জেলে যেতে প্রস্তুত আছি, জীবন দিয়েও এ আন্দোলন চালাইতে হইবে। ভয় কি? ধর্ম্মের জন্য আত্মদানে এত কুণ্ঠা, দ্বিধা, আশঙ্কা কিসের! মানুষ চাই, এমন গোটা মানুষ চাই যে অসঙ্কুচিত চিত্তে বল্‌তে পারে এ প্রাণ বিধাতার দেওয়া বিধাতার কার্য্যেই উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। বাঙ্গালা দেশে কি মানুষ নাই? আজও কি ধর্ম্মের এ আহ্বান কেহ শুনিতে পাও নাই? যদি তা না পেয়ে থাক, তবে শোন, জাগো, ওঠ, যার প্রাণে শক্তি আছে। শক্তি চাই—শক্তিদাও, শক্তিদাও, তবেই সবচেষ্টা সিদ্ধ হইবে।......জগজ্জননী মা! জাগিয়েদেমা, জাগিয়েদে! বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে তাহা আরও দ্বিগুণতর করিয়া জাগিয়েদে!"

৩। ভারত ও ভারতবাসী—

[১]

"ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের পিতৃ পিতামহগণ সহস্র সহস্রবৎসর ধরিয়া এ দেশে বাসকরিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা বাস করিতেছি। এ দেশের প্রতি ধূলিকণা আমাদের কাছে অতি পবিত্র।"

[২]

"দেশ বলিলে আমি ইষ্ট দেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি নাই।

দেশকে সেবা করিলে মানব সমাজকে সেবা করা হয়। আর মানব সমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।"

[৩]

"আমার কাছে দেশসেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়! সে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশমাতৃকার মূর্ত্তির মধ্যে আমার ভগবান ও জাগ্রত।"

[৪]

"দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর পাইলেই আমি কখনও তাহাতে পশ্চাৎপদ হই নাই, হয়ত সকল সময়ে আমি ঠিক পথ ধরিতে পারি নাই। হয়ত আমি অসঙ্গত পথেই চলিয়া থাকিব কিন্তু একথা ঠিক যে, দেশের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়াই আমি সর্ব্বদা কার্য্য করিয়াছি।"

[৫]

"ভারতবর্ষ কোনও দিন বিজিত হয় নাই। ভারতবর্ষ শুধু প্রেম ও সুশাসনে শাসিত হইবে এই অঙ্গীকারেই বিদেশীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে কেহ জয় করিয়া লয় নাই। ভবিষ্যতেও কেহ ইহাকে জয় করিতে পারিবে না।"

[৬]

"স্বদেশে আমরা ক্রীতদাস। স্বরাজ ব্যতীত জীবন দুর্ব্বিসহ।...... আমি চাই ভারতীয়দিগকে এখন নিজেদের শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।"

[৭]

"আমার হাতে হাতকড়ি ও দেহে লৌহশৃঙ্খলের ভার অনুভব করিতেছি। ইহা দাসত্বের যন্ত্রণা। অখণ্ড ভারত আজ একটি বৃহৎ

কারাগার। আমি গ্রেপ্তার হই বা না হই তাহাতে কি আসে যায়? আমি বাঁচিয়া থাকি বা মরিয়া যাই জাতীয় মহাসভার কাজ চালাইতে হইবে।”

[৮]

“আমি ঘোষণা করিতেছি যে প্রয়োজন হইলে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন দান করিতে প্রস্তুত আছি। আমি স্বদেশকে ভালবাসি—স্বদেশ শাসন করা আমার জন্মগত অধিকার। যদি এই দেশপ্রীতি অপরাধ হয় তবে আমি অপরাধী, স্বীকার করি। যদি ইহা রাজদ্রোহিতা হয় তবে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে রাজি আছি।”

[৯]

“আমার বিবাদ ব্যক্তিগত ভাবে একেবারেই নহে—আমার দেশের শাসন পদ্ধতির সহিত আমার বিবাদ। এ দেশের কুশাসনের জন্য এই শাসন পদ্ধতিই দায়ী। শাসনপদ্ধতি মন্দ কেন? যেহেতু ইহার দায়িত্ব জ্ঞান নাই। ভারতবর্ষের শাসন তন্ত্র কাহার কাছে দায়ী? ভারতের জনসাধারণের কাছে নহে। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের আদেশমত ইহা চালিত হয়। এই দায়িত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় করিবার মত সময় বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নাই। এই অবহেলা ঔদাসিন্যের জন্য নহে, ইহা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত।”

[১০]

“আমি এই দেশের উপযোগী করিয়া আমার শাসন বিধিসমূহ গঠন করিবার ক্ষমতা চাহি। সেই গুলি ভবিষ্যতে ‘মহৎ ভারত শাসন নীতি’ রূপে পরিচিত হইবে। উচ্চ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সকলেই এক মত। এক্ষণে আসুন, সেই জন্য যুদ্ধ করিবার মত শক্তি সঞ্চয়

করি, আমাদের সমস্ত শক্তির সহিত যুদ্ধ করি এবং যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সেই অধিকার প্রাপ্ত না হই ততদিন নিবৃত্ত হইব না।”

[১১]

“আমরা শুধু ইহা অনুভব করিতে চাই যে, এদেশ প্রকৃতই আমাদের—আমরা যে একটা জাতি, তাহা আমরা বুঝিতে চাই, আমাদের যে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহাও আমরা অনুভব করিবার কামনা রাখি।”

[১২]

“আমি চাই সমস্ত ভারতবর্ষের লোক সমস্বরে বলিবে, আমাদের শাসনকার্য্য আমরা চালাইব। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার। কোন শাসনতন্ত্রই আমাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে তোমরা ইহা বুঝিবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমরা স্বরাজ পাইবে।”

[১৩]

“সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে ‘চাই’, জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে। এস ভাই খৃষ্টিয়ান খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল ‘চাই’! এস ভাই মুসলমান আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল ‘চাই’! এস ভাই হিন্দু তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল ‘চাই’! ঐ যে মা ডাকিতেছে এস এস সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা! বল নারায়ণ! বল বন্দেমাতরম্!”

[১৪]

"এস ভাইসকল আমরা এই অন্ধকার কাল স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা চৌষট্টিকোটি ভুজে ও প্রতিমা তুলিয়া তেত্রিশকোটি মাথায় বহিয়া মা'র প্রতিমা ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে; উহারা পথ দেখাইবে —চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি, ভয় কি? না হয় ডুবিব! মাতৃহীনের জীবনে কায কি?"

[১৫]

"আমার কি হবে জানি না, জানি না আজকের এই সব জীবন কি হবে, শুধু এই কথা জানি, জগতে জাগ্‌তে হবে। আজ আমার চোখের সাম্‌নে সেই ছবি শুধু জাগে—মিলিত ভারত একটি উন্নত গৌরবান্বিত জাতি। তখন আমি জীবিত থাকি বা না থাকি, আমার পুত্র কন্যা জীবিত থাকে বা না থাকে, একটি জাতি জাগ্‌বে—আত্ম-প্রতিষ্ঠায়—আত্ম গরিমায়—এমূর্ত্তি আমার লক্ষ্য। প্রয়োজন হলে এই সাধনায় আমি জীবনের প্রিয়তম সব কিছু বিসর্জ্জন দিব; এবং এই সাধনায় যদি মরে যাই ক্ষতি কি? যদি মরি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার আমি এই মাটিতেই জন্মাব, বারে বারে, প্রতি জন্মে জন্মে, এরি মাটির কোলে এসে এসে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে এর পূজা ক'রে ফিরে যাব, আবার আস্‌ব যতদিন না আমার আশা ও ধ্যান মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে।"

[১৬]

"রেভোলিউশনারদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ঙ্কর মারাত্মক। এই

একৃটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ ২৫ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এজিনিষ যাবে না। তখন আরও স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, সামান্য মতভেদে একেবারে সিভিল ওয়ার বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।"

[১৭]

"স্বাধীনতা বা মুক্তি সর্ব্ববিধ সংযমের অভাব নহে; বরং যে অবস্থায় জাতি তাহার স্বতন্ত্র স্বরাজ লাভ করিতে পারে ও স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সেই অবস্থাই স্বাধীনতা বা মুক্তি।"

[১৮]

"আমরা দাসের জাতিতে পরিণত হইতেছি। ভারতের প্রাণ পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে দেখা যায় গ্রামবাসীরা শ্রমশীল, নির্ভীক, কিন্তু ললাটে তাহাদের পরাধীনতা জনিত দুর্দ্দশা অনপনেয় ভাবে অঙ্কিত। বৎসর বৎসর যে ভারতবর্ষ হইতে কোটি কোটি টাকা বিদেশে যায়, আমরা তার বিনিময়ে অতি যৎসামান্যই লাভ করি। আমরা বিজেতাদের ভাষা ব্যবহার করি, তাহাদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করি, আমরা আমাদের পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান অবহেলা করিয়া তাহাদের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে ব্যগ্র হই।"

[১৯]

"আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি সেই আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাহা ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে,

আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই, আমরা যে তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কোন কাজে তাহাদের ডাকি?"

[২০]

"যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহারাই এদেশের প্রকৃতলোক, জাতি বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়। যদি কখনও এদেশের উন্নতি ঘটে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই ঘটিবে,—বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইহারা জাতীয়ত্বের দাবী লইয়া দাঁড়াইবে; তবে তৎপূর্ব্বে এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া চাই।"

[২১]

"আমাদের দেশের কৃষকসম্প্রদায় উন্নত অবস্থায় জীবনধারণ করিবে, ইহা জাতির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক। যাঁহারা এদেশে 'স্বরাজ' বা স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠার কামনা করেন, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে এই কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।"

[২২]

"আজ আমাদিগকে দেহে মনে বাক্যে শুদ্ধ হইতে হইবে; ভেদাভেদ, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের সত্যিকার নিবিড় আলিঙ্গনে এক হইতে হইবে। তাই আজ মায়ের নামে প্রেমের জোয়ার দেশ ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এ জলতরঙ্গ রোধিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই।"

[২৩]

"হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে ছিল না। টোডরমল্ল, বীরবল, যশোবন্তসিংহ, মানসিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন। এখনও হায়দ্রাবাদে যেখানে হিন্দু প্রজা বেশী, রাজা মুসলমান; অথবা কাশ্মীরে যেখানে মুসলমান প্রজা বেশী,

রাজা হিন্দু; সেখানে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি বৃটিশ শাসনে। কিন্তু আজ ভারতমাতার দুটি সন্তান হিন্দু মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক—বিদেশীর স্বার্থ, উভয়কে বিভিন্ন রাখা।"

[২৪]

"উপযুক্তরূপে সংঘবদ্ধ না হইলে এবং আমাদের অনুষ্ঠানের স্বরূপ লোকে না বুঝিলে আমাদের অবাধে সাফল্য লাভ অসম্ভব। হাঙ্গামা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মত জনগণের কাছে প্রচার করিতেই হইবে। জগতে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানেই চাঞ্চল্য ও রক্তপাত হইয়াছে—খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সেজন্য কি মত প্রচারে বিরত হওয়া সঙ্গত?......................নানা স্থানে নেতৃগণের অন্যায় অবরোধে যে জনগণ বিচলিত হয় নাই—শান্তি ভঙ্গ হয় নাই, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—লোক অহিংস অসহযোগের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। দেশবাসী সাহসের, ধৈর্য্যের ও সংযমের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।"

[২৫]

"আজ যাঁহারা দেশসেবার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। মৌলানা-সৌকতআলী ও মৌলানা মহম্মদআলী যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। বীরবর লালা লজপৎ রায় যে ব্যুরোক্রেশীর আদেশ অমান্য করিয়া কারাগারে গমন করিয়াছেন, সে তেজ ব্যর্থ হইবার নহে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, যে আদেশ তাঁহাকে দাসত্বে পরিণত করে, তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন—

সে ত্যাগ কি ব্যর্থ হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের জয় যাত্রায় পথিপ্রদর্শক—তাঁহাদের আদর্শের বর্ত্তিকালোক আমাদিগকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।"

[২৬]

"ভগবান কেবল একবার ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই, অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারীরা বার বার মনুষ্যত্বকে এইরূপে ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছে এবং মনুষ্যত্বের উপর এরূপ প্রত্যেক অত্যাচার ভগবানের পবিত্র দেহে এক একটি নূতন পেরেক প্রবেশ করাইয়া দিতেছে।"

[২৭]

"অত্যাচারই অত্যাচারের সৃষ্টি করে।.........গভর্ণমেণ্টের হিংসামূলক শাসনপদ্ধতিই দেশের প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।"

[২৮]

"দেড়শত বৎসর শাসনের পরও যদি দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিতই রহিয়া থাকে, তবে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট কি করিলেন? স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে, বিশবৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের এমন অবস্থা ঘটিবে যে, ভারতের কোনও স্থলে একটি নিরক্ষর লোক দেখা যাইবে না।"

[২৯]

"গভর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি—বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে তোমরা এমন কি করিয়াছ যাহাতে এ দেশের লোক স্বাধীন হইতে পারে, অথবা এমন কি শিক্ষা দিয়াছ, যাহাতে তাহারা স্বাধীন হইবার যোগ্য হইতে পারে?"

[৩০]

"এই দেশের রাজত্বের সঙ্গে ইংরাজের অবস্থার কি শতসহস্রগুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানবসমাজে যে ইংরাজ আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে কি বাংলার সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই নাই? এই যে কৃতজ্ঞতা ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞতা হইবার কি কোন কারণ নাই? এই যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলন ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা তাহার প্রমাণ আজ চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোনও অর্থ নাই।"

[৩১]

"সংগ্রাম ব্যতীত আমরা ইংরাজের নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারিব না—যদিও সেই সংগ্রাম নিরুপদ্রব ও বৈধভাবে করিতে হইবে এবং সেই সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে প্রথমেই লোকমত গঠন করিয়া নিতে হইবে।"

[৩২]

"আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই।"

[৩৩]

"আজ এই দুর্দ্দিনের দুর্যোগে আমাদের নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে

প্রবেশ করিতে হইবে ও অবনত মস্তকে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে।…আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব।”

[৩৪]

“এস আমরা আজ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লক্ষ কণ্ঠে বলি—‘উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত’—।……পাশববলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। যদি কেউ স্বদেশকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস তবেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য’—।……এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। সকল হিংসাদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশপ্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য্য।”

[৩৫]

“জীবন সন্ধ্যায় শঙ্খরোল কাণে আসিতেছে। দুঃখ আমার কিছুই নাই, কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দেশের পক্ষে যে অত্যাবশ্যক, জাতীয় ইতিহাসের সেই সঙ্কট সময়ে দেশ কি ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে?”

৪। স্বরাজ সংগ্রাম ও দেশের কাজ—

[১]

“আমার নিজের যেটুকু অধিকার, তাহা ভগবানের দান, কোনও মানুষের তাহা কাড়িয়া লইবার অধিকার নাই।……প্রত্যেক মনুষ্য-জাতি স্বাধীন। আমরা কোন জাতির অধিকার হরণ করিতে চাই না, কিন্তু অন্য কোন জাতি যেন আমাদের প্রকৃতিগত উন্নতির পথ রোধ

না করে।……এই অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবর্ষে এই জীবন-নিষ্পেশনকারী আমলাতন্ত্রের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

[২]

"এস ভাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, এস চাষার সঙ্গে যাদের ঘৃণা কর্‌তাম তাদের সঙ্গে। বাঙ্গলা ত্যাগমন্ত্রে এক হউক। জগতে দেখাই ভারতে ত্যাগেরই জয়, ভোগের জয় কখনো নয়। দলে দলে ছেলে বেরও; দেশে দেশে যাও। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমিতি খুলুক্। চরকার কাজে লাগ। চরকার পুনরুত্থানে স্বরাজ্ প্রতিষ্ঠা হবে।"

[৩]

"স্বরাজ বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায়, গাছের ফলের মত পড়্‌বে না। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। আমার জীবনে দেখিতেছি আমি যখনই যা প্রাণ দিয়ে চেয়েছি, তাই পেয়েছি। প্রাণের সাধনা না হলে কোন মূল্যবান্ জিনিস লাভ হয় না। যখন দেখ্‌ব আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পাখীর মত পাখা ঝাপ্‌টাইতে থাক্‌বে তখনই বুঝ্‌ব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান। আমার প্রাণে কে যেন অলক্ষ্যে লিখে দিয়েছে স্বরাজ ছাড়া জীবন রাখা বৃথা।"

[৪]

"এই স্বরাজ সংগ্রামে চাই ত্যাগ। আপনারা ত্যাগ করিতে ভয় পান্, বলেন অনেক difficulty আছে,—আমার চাইতে আপনাদের difficulty বেশী নয়। বাঁধা মাসিক charity আমার দু'হাজারের উপর ছিল, আমি তাহা নির্ম্মমভাবে কেটে দিয়েছি। তা' বন্ধ কর্‌তে আমার প্রাণে যে কত বড় বেদনা লেগেছে তা আপনাদের কি বল্‌ব?

যারা প্রতি মাসে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃত আমি তাদের নিরাশ করেছি।"

[৫]

"স্বরাজের জন্য আমার যাহা কিছু প্রেয় ও শ্রেয় তাহাই প্রয়োগ করিব। স্বরাজ লাভের পূর্ব্বে যদি এ দেশের কাজ করিতে করিতে আমার মৃত্যু হয় আবার এই বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিব যত দিন না স্বাধীনতা লাভ হয় এই দেশজননার ক্রোড়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন দিব।"

[৬]

"আমাকে যদি বাঁচিতে হয় স্বরাজের জন্যই বাঁচিব, যদি মরিতে হয় স্বরাজের জন্যই মরিব।"

[৭]

"আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে এই যে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন, এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন।......গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর ত্যাগ করিতে হইবে।"

[৮]

"আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আমার মান, ধর্ম্ম থাকিল কই?......আমার আহার জোটে না, বস্ত্রাভাবে লজ্জারক্ষা হয় না। আমার স্ত্রীপুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয়।

সে কারণ স্বরাজ আমাদের চাই। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নয়—কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের।"

[৯]

"সংস্কার, সংস্কার! আমরা উহার কিছুই চাই না। তোমার দান ফিরাইয়া লও। যদি ব্যুরোক্রেশীর দাসত্বই করিতে হয়, যদি আমাদের প্রতিপদেই বাধা বিঘ্ন ঘটাইতে চাও, যদি ব্যুরোক্রেশীর ইচ্ছা মাত্রেই আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, তবে ঐরূপ সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নাই।"

[১০]

"আমি যদি বুঝিতাম এই Reform Actএ সত্যিকার কোন ক্ষমতাও দায়িত্ব যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে···যাহার বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূরণ করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি তাহাহইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamberএর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীকে সেরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম, কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি।······ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই কেবল যদি গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোন বাধা না দেন।"

[১১]

"বর্ত্তমান Reform Actএর আসল কথা হইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট

মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করে না। যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সহযোগিতার কথা মুখেও আনা যায় না।"

[১২]

"ভদ্রমহোদয়গণ, এ কথাটা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যদি আপনারা নিজেদের স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আজ হইতে এই ব্রত গ্রহণ করুন যে, এজন্য তীব্র আন্দোলন করিবেন। শুধু কথাতেই অধিকার জন্মে না। কখনও তাহা হয় নাই। নিজের অবস্থা যদি বুঝিয়া থাকেন, তবেই অধিকার পাইবেন। যদি ইতস্ততঃ করেন, তবে মারা যাইবেন, কিছুই পাইবেন না। জাতির অধিকার কাপুরুষের যোগ্য নহে।"

[১৩]

"স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা।...যাঁরা মনে করেন স্বরাজ একটা শাসন প্রণালী তাঁরা জানেন না যে, স্বরাজ হলে তবে শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরাজ আগে, শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা পরে। স্বরাজ অর্থ কি? স্বরাজ অর্থ হিন্দু-মুসলমান মিলে যে নবীনজাতি গড়ে উঠেছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-প্রণালী।"

[১৪]

"আমরা আমলাতন্ত্র চাহি না, আমরা চাই স্বায়ত্বশাসন। এই স্বায়ত্বশাসনে দেশের লোকেরই কর্তৃত্ব থাকিবে এবং ইহা দেশের লোকের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাতে প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার হইতে নিঃস্ব প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে।"

[১৫]

"বিশ্বাস চাই, কাজের ক্ষমতা চাই, শক্তি চাই।...চাই বিদেশীর হাত হ'তে মুক্তি পেতে—চাই অপবিত্রতা, মনুষ্যত্বহীনতার হাত হ'তে নিজেদের উদ্ধার করিতে।"

[১৬]

"আমি প্রত্যেককে মনে রাখিতে ও বিশ্বাস রাখিতে বলি যে, আমাদের সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণরূপে শান্ত সংযত ও উপদ্রব-বিহীন থাকিবার উপর।...আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা জন-সাধারণকে শান্ত ও সংযত রাখিতে যে পরিমাণে অসমর্থ হইব—তা তাহারা গুণ্ডাই হউক—আমাদের অসহযোগ ব্রতও সেই পরিমাণে নিস্ফল। দায়িত্ব সবই আমাদের।"

[১৭]

"যিনি স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে দাঁড়াইবেন, তিনি ভারতীয়ই হউন আর ইউরোপীয়ই হউন, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের অনুবর্ত্তক বলিয়া মনে ভাবিব।"

[১৮]

"যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয় সেও পাপ করে, আর যে ক্লীব ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সেও পাপ করে।"

[১৯]

"দ্বৈতশাসনে আমার আস্থা নাই, ইহার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই, কোন যোগ নাই, আমি কোন আনুকূল্য করিতে চাই না, কারণ এ শাসন পদ্ধতি হইতে আমার দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।"

[২০]

"যে শাসন পদ্ধতি আমার এদেশের কোনও মঙ্গল করে না, করিতে পারে না, আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে চাই। আমরা এই শাসন যন্ত্র ভাঙ্গিতে চাই, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য, ইহার স্থলে আমরা এমন যন্ত্র প্রস্তুত করিব, যাহার দ্বারা দেশের আপামর সাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।...আমাদের দেশের শাসনপদ্ধতি অধর্ম্মমূলক ও অকল্যাণকর। যে উপায়ে ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, যে উপায় ইংলণ্ডের পক্ষে ভাল বলে বিবেচিত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই উপায় এই দেশে অবলম্বিত হইলে তাহা নিন্দিত হয়।......স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ধ্বনিত প্রত্যেক কণ্ঠ রুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র চেষ্টা নিন্দিত ও বাধাপ্রাপ্ত। আমাদের মুক্তির জন্য আমরা যাহা কিছু করিতে চাই, তাহা ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া গণ্য। দেশের এই অবস্থা, আমাদের এই অবস্থা।......আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি অন্যায় ও অধর্ম্মমূলক এবং কোন সৎ-লোক আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া এই গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না।......যে গভর্ণমেণ্ট সৎ, সম্মানার্হ এবং প্রজাহিতরত, সেরূপ গভর্ণমেণ্টের সহিত আমরা সহযোগিতা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

[২১]

"ইংরাজ যদি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করেন, তবেই ইংরাজের সহিত সহযোগ করিতে সম্মত হইব—নহিলে নহে। যে জাতি আমাদের দেশাত্মবোধের পথ বিঘ্নবহুল করে, সে জাতি আমাদের মিত্র নহে।......আমরা মুক্তি চাহি, মুক্তি লাভ আমাদের কাম্য। আমরা সেজন্য চেষ্টা করিব—যদি পরাভূত হই, তবুও আমাদের জাতীয় আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

[২২]

"ভারত-শাসন-আইন সরকারের সহিত সহযোগের ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ভারতবাসী অসম্মান জনক শান্তি চাহে না—যতক্ষণ ভারত-শাসন-আইনের মুখবন্ধ বিদ্যমান থাকিবে এবং আমাদের আত্মকার্য্য নিয়ন্ত্রণের, আত্মবিকাশের ও আত্মবোধের অধিকার অস্বীকৃত রহিবে, ততদিন মিটমাটের কথা উঠিতে পারে না।"

[২৩]

"(হে শাসক জাতি!) তোমরা ও একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমাদের কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও, সম্মুখে অগ্রসর হও, জাতিগত বৈষম্যের কথা বিস্মৃত হও, বৃথা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানকে সরাইয়া দাও, আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াও—আমাদের হাত ধরিয়া থাক, আমাদিগকে আপনার করিয়া লও, দেখিবে এদেশে আমরা এমন এক দল গঠন করিয়া তুলিব যে বৈদেশিক আক্রমণকারীর শক্তি যতই প্রবল পরাক্রান্ত হউক না কেন, আমরা তাহাকে পরাজিত করিয়া হটাইয়া দিব।"

[২৪]

"স্বায়ত্বশাসন শুধু কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। দেশের আপামর জনসাধারণ প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্বশাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, আমাদের কার্য্য তাহাই। স্বার্থপরতা আমাদের নাই।...... আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা। আমার কি হইবে, তাহা আমি জানিতে চাহি না, বর্ত্তমান বাঙ্গালীর কি হইবে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই, আজিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি

হইবে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই আমার জাতির কি হইবে।"

[২৫]

"ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্ত্বশাসন হইবে না, মুসলমানদিগের স্বায়ত্ত্ব-শাসন হইবে না, জমীদারদিগের স্বায়ত্ত্বশাসন হইবে না, ইহা হইতেছে সমগ্র বাঙ্গলার প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্ত্বশাসন, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হইবে এবং যাহারা সমাজে প্রপীড়িত, তাহাদের বলিতে হইবে, এমন স্বায়ত্ত্বশাসন যত শীঘ্র স্থাপিত হয় ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল-জনক। এই দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রণালীতে তাহাদের নিকট যে ক্ষমতা আসিবে, তাহাতে তাহারা সকল অত্যাচার রোধ করিতে পারিবে।"

[২৬]

"ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের লোককে একতাবদ্ধ করিতে হইলে, এবং সর্ব্ব সাধারণের ভিতর শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে, তাহাদিগকে একত্র লইয়া একই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দিতে হইবে; সুতরাং আমাদের ধর্ম্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দুর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব-শাসনই একমাত্র উপায়।"

[২৭]

"আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে কোনও রাজনৈতিক অধিকার পাই-বার আশা বৃথা। আমাদিগকে আমলাতন্ত্রের পরিচালকদের নিকট যাইতে হইবে। বৃটিশ জনসাধারণের নিকট আমাদের নায্য দাবী উপস্থিত করিতে হইবে।"

[২৮]

"স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার দিবেন এবং কতটুকু দিবেন না, এসমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন

নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যতটুকু অধিকারের প্রয়োজন, আমাদিগকে ততটুকুই দাবী করিতে হইবে, গভর্ণমেণ্ট দিবেন কি না দিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভীত হইয়া কোন কাজ করিবেন না, তাহাই গভর্ণমেণ্টের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত করিতে হইবে।"

[২৯]

"গভর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, আমরা তাহাতে ভীত নহি,—আমাদের দেশবাসীগণ আমাদের সহায়। এই Councilই আমাদের মুক্তির এক মাত্র সোপান নহে। আমি জোর করিয়া বলিতেছি তাহা নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়া কিছু করিবার পাত্র নহেন। আমাদের রক্ষণশীল ইংরেজ-শাসন-বিধাতাগণ ভয় পাইবেন কিনা তাহা আদৌ আমার চিন্তার বিষয় নহে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট কিছু আদায় করিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় এই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টও বিলক্ষণ জানেন যে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া যে অমর-শক্তি জাতির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে তাহার সাফল্য কোন রকমেই রোধ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট রক্ষণশীল হউক, শ্রমিক হউক, বা উদারনীতিক হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতবাসীর নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করাই আমার একমাত্র কাজ, আমি আজ সেই আকাঙ্ক্ষা বিঘোষিত করিতেছি। গভর্ণমেণ্টের নীতিপদ্ধতি যাহাই হউক, ভারতবর্ষের মত মহৎ ও গৌরবময় দেশের মর্ম্মগত আকাঙ্ক্ষা রোধ করা পৃথিবীর কোনও গভর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ব নহে।"

[৩০]

"এই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। সেইজন্য আমাদের এখন ঠিক কি অবস্থা তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে কেন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে? সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য কি অন্য কারণে? ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে চাষযোগ্য যত জমী আছে সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।"

[৩১]

"আমাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই স্বাধীনতা আসিবে।.........আমরা এখন হইতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীতে এই কথা প্রচার করিতে থাকি যে, যতক্ষণ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার সমর্পিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমরা কোন মতেই নিরস্ত হইব না, সন্তুষ্ট হইব না।"

[৩২]

"আমার বিবেচনায় কাউন্সিলে যাওয়া অবশ্যক, সেই রকম চরকা কাটাও যে শুধু আবশ্যক তাহা নয়। চরকা না কাটিলে কাউন্সিল গমনের দ্বারাও সাফল্য লাভ সম্ভব নহে।"

[৩৩]

"মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জ্জনে যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে। এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকদের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষীর ঘরে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে।"

[৩৪]

"আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ অস্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্যের যোগ আছে। আমাদের একহাতে দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর একহাতে তাহারই সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র্য তাহাও ঘুচাইতে হইবে।"

[৩৫]

"(গ্রামে গ্রামে পল্লীসমাজ গড়িতে হইবে।) এই পল্লী-সমাজ প্রতি গ্রামে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষা মাত্রেই এই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লীসমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ চাষাদের প্রয়োজন মত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।......অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।......চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পায় তাহার ব্যবস্থা

করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।......... যদি সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া স্কুল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, নৈশবিদ্যালয়, সালিশী, পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করতঃ সেই সেই গ্রামের চাষ-আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা-ঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিবাদ, বিসম্বাদ, দলাদলি মিটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, প্রতিগৃহে তুলার গাছ, চরকায় সুতাকাটা ও তাঁতে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উচ্চ নীচের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে, তবে সমস্ত স্বাবলম্বী গ্রামগুলির সমবায়ে একটি বিরাট স্বাবলম্বী দেশ তৈয়ারী হইয়া অতি সহজে এই পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

৫। জাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা—

[১]

"মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসম্বিৎ, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষাদীক্ষার কার্য্য।"

[২]

"দুই আর দুই যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষাসমাপ্ত হয় না, আমাদের দেশ-জননীর সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।"

[৩]

"আমাদের সবচেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃ শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।"

[৪]

"আমাদের হাবভাব, আচার ব্যবহার এত ইংরাজীনবীস হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলো ইংরাজী পদ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু চালাক হইয়াছি মাত্র। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়া-মায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তাহারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নব জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষায়ই দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে, এবং আমাদের শিক্ষা দীক্ষার যে সকল সত্য বাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

[৫]

"আমরা যখন আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিব তখন আমরা প্রয়োজন বুঝিয়া অন্যান্য দেশের ভাব গ্রহণ করিব, তাহার পূর্ব্বে নহে। গৃহে না থাকিলে কেহ কি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে পারে?"

[৬]

"আমাদের এই ইউনিভারসিটি ফ্যাক্টারিতে বি এ,এম্ এ,পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস্ এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারী হয়। প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না। এই শিক্ষা আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসম্বিৎকে জনমের মত বিসর্জ্জন করিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী, আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী; সে আত্ম-জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয়। আর বিজ্ঞানের বড়াই করে।"

[৭]

"......নিশ্চয়ই এই শিক্ষার মধ্যে আমাদের দাস মনোভাব অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং আপামর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আমাদিগকে করিতেই হইবে। কিন্তু দরিদ্র পরাধীন জাতির পক্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে নিজের হাতে নেওয়া বড়ই দুষ্কর ব্যাপার; এইজন্য ধীরে ধীরে আমাদিগকে তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।"

[৮]

"আমরা আহারে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে সমস্ত জীবনক্ষেত্রে প্রতিপাদবিক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল্ করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি, যত রকমের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার সহজ উপায় দেশে ছিল, তাহার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবন যাপনের উপায় মাত্র, তাহা

ভুলিয়া গিয়া বিলাতী Industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

[৯]

"অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমার শিক্ষা দীক্ষার জন্য আমি ইউরোপের কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাহা হইলেও আমি ভুলিতে পারি না যে ইউরোপীয় রাজনীতির ধার করা জিনিস লইয়া আমাদের জাতীয়তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।"

[১০]

"ভারতবাসী ইংরাজ বলিয়াই ইংরাজের সহিত অসহযোগে প্রবৃত্ত হইবে না; কিন্তু যে কোন জাতি বা প্রতিষ্ঠান তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট বিকাশের বিরোধী হইবে, সে তাহারই সহিত অসহযোগ করিবে। জাতীয় শিক্ষা বিদেশী শিক্ষার সহিত বিদ্রুহ্ নহে। তাহার উদ্দেশ্য অতীতের সহিত সংযোগ সংরক্ষণ ও আমাদের জ্ঞানকে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।"

[১১]

"আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে অবদান স্বরূপ একটি মহতী সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এক আধ্যাত্মিকতার রক্ষক হইয়া আছি। তাই আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করিতে হইবে। আমরা সেই অগ্নি পুনরায় উদ্দীপ্ত করিব। যাহা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহাকে জীবন্ত এবং উজ্জ্বল করিতে হইবে।"

[১২]

"ইতিহাসের পথ গতি মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তাহাও এক প্রচণ্ড গতিপথে যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস—অথবা এক বিস্তর মুক্তিপথে পুনঃ পুনঃ দুর্দ্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারত-

বর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে, শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।······ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড়-জগতের পরিবর্ত্তনশীল মায়া-প্রপঞ্চ প্রভৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে।·········ইতিহাস কি ভগবানের লীলার বাহিরে? যারা তাহা মনে করে, তারা ইতিহাস জানে না, ভগবানের লীলা বুঝে নাই। প্রত্যেক জাতি ভগবানের লীলার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভগবানের লীলার সহচর।”

[১৩]

“দেশবাসীকে বলি—প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বলিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। তাহার পর নির্ভীকভাবে জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার তাহা গ্রহণ কর।”

[১৪]

“পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চল্‌ছে, তাতে আমার কোনও আস্থা নাই। যার যেটা নিজস্ব ভাব—সে সেইটে দেশের জনসাধারণের নামে চালাচ্চে। জনসাধারণের ভাব, আকাঙ্ক্ষা, বা অভাব বুঝ্‌তে দেশের কোন নেতাই চেষ্টা করেন না। শুধু দেশের নামে লম্বা লম্বা বক্তৃতা কর্‌চেন। এইসব Shame agitation এর আমি বিরোধী। দেশের জনসাধারণ যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, এবং সমস্ত বিষয় জান্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে সেরূপ—Organisation করা দরকার। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, জগতের যে কোনও দেশের চেয়ে আমাদের দেশের লোক অনেকগুণে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তারা দেশের কোন কাজটা ভাল, কোন কাজটা মন্দ, অনায়াসেই

বুঝ্‌তে পারে। বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণকে দলবদ্ধ করে কাজ করলে তার শক্তি কেউ রোধ করতে পারবে না। প্রাচীন ভাবকে ভিত্তি করে নূতন গড়্‌তে হবে।"

[১৫]

"Industrialism বাঙ্গালা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতী ফ্যাক্টরী রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে।"

[১৬]

"কল কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের গরীবেরা ইউরোপের গরীবদের মত নৈতিক-চরিত্র-হীন হয়ে নিষ্পিষ্ট হবে—তাথেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। Cottage industry যাতে revived হয় তার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। মূলকথা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে আত্মশক্তির উপর জাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

[১৭]

"ভারতবর্ষ তাহার আদর্শ-শিক্ষা ও সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে বিলাইয়া দিবে। আজ সে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এমন একদিন আসিবে যখন ভারতবর্ষের কথা বিশ্ববাসীকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে।"

[১৮]

"প্রত্যেক জাতিরই তাহার জন্মগত স্বভাব অধিকার অনুসারে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে, উন্নত হইতে হইবে—আমরা সেই অধিকারের দাবী করিতেছি। (ঘুমের ঘোরে) যে অধিকার হইতে এতকাল বঞ্চিত ছিলাম......এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।"

[১৯]

"ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেইমুহূর্ত্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। বাহিরের রূপ, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু।"

[২০]

"জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতী-আদর্শ-জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।"

[২১]

"তামাক ছাড়্‌তে আমার যা কষ্ট হয়েছিল, এতকষ্ট বোধহয় আর কোন জিনিষ ছাড়্‌তে হয়নি। আমি দেশের লোককে বিলাসের সমস্ত উপাদান ছাড়্‌তে বল্‌ছি, আর আমি নিজে তামাক খাব!"

[২২]

"কোন জাতির সংস্কার অন্যজাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে তাহার বলেই হইবে।"

৬। সমাজ সংস্কার—

[১]

"নমঃশূদ্রদের ধোপা নাপিত নাই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না,

অথচ এরাই মুসলমান, খৃষ্টান হয়ে গেলে আবার উচ্চবর্ণ হিন্দুদের ধোপা নাপিতরাই এসে এদের কায করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বল্‌ছে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান খৃষ্টানই বড়। এরকম সেন্সলেস্ সমাজ মর্‌বে না ত মর্‌বে কে ?”

[২]

“আপনারা আমায় politics থেকে রেহাই দিন আমি কোন গাঁয়ে কুটীর বেঁধে সামাজিক অত্যাচার সব দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করি।……এজীবনে যদিও না পারি, আমি পরজন্মে অস্পৃশ্য হইয়া আসিব, আবার তাহাদের মধ্যে কাজ করিব।”

[৩]

“সমাজটা বাস্তবিকই এমন মরা মরেছে যে ইহার একটুও সাড়া পাওয়া যায় না। কত স্নেহলতা অত্যাচারের মুখে আত্মবলিদান করিল, তবু বেটা-বেচাওয়ালাদের চৈতন্য হইল না। তবুও মেয়ের বাপরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে কন্যা পার করিতে পারিলেই বাঁচেন।”

[৪]

“সমাজে বিধবাদের জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যেরগণ্ডিতে রাখা আমার অসহ্য মনে হয়। জোর করিয়া বিধবাকে বিবাহ দেওয়া যেমন অন্যায়, জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ না দেওয়াও তেমনই অন্যায়।”

[৫]

“তোমরা মনে মুখে এক নও। যা ভাব তা কর্‌তে ভয় পাও। যদি বুঝে থাক, বাল্যবিবাহ দোষের হাজার পীড়াপীড়িতেও তা দিতে পারিবে না। ভাল বর সকল সময়েই পাওয়া যায়। যদি বামুনের মধ্যে না পাও অন্য জাতের মধ্যে পাবে। অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি ?”

আমি যদি তিনশ' Sincere বাঙ্গালী ছেলে পাই তবে দেশ উদ্ধার, সমাজ সংস্কার,—সব কিছুই করিতে পারি। তোমরা কাজ কর্‌বার আগে ভাব, কাজের ফলাফল বিবেচনা কর; কিন্তু আমি তা কখনো করি না। ফলাফল না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি কখনো আগুপিছু ভেবে কাজ করিনে।"

৭। সাহিত্য সমালোচনা—

[১]

"বর্ত্তমান সাহিত্যেও সৌন্দর্য্য ও কলাকুশলতা আছে। তবে দেশী আর বিলাতী ফুলে যা প্রভেদ। যেদিন থেকে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানী হ'য়ে তাহা আমাদের ভাষায় মিশে যেতে লাগ্‌লো—অশিক্ষিত জন সাধারণের পক্ষে তা তত দুর্ব্বোধ হ'তে লাগ্‌লো। এখনকার সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে যে আমরা শিক্ষিত সমাজ সব বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে পেছনে ফেলে দিয়ে নিজেদের একটি গণ্ডী তৈয়ার কর্‌ছি,—ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি বা সাহিত্য-সব বিষয়ে। তাই কোনটাতে প্রাণের সাড়া নাই।"

[২]

"ভাষা কঠিন বা কোমল বলে কোনও কথা নাই। আগেকার ভাষার শব্দ বিন্যাস দেখ্‌তে গেলে এখনকার অনেক শিক্ষিতের পক্ষেও তাহা দুর্ব্বোধ্য। দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায় যে কোন কবিতার শব্দের অর্থ করিতে পারিত বা বুঝিতে পারিত—এটা আদৌ আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রাচীন কবিরা এমন একটা সুরের সৃষ্টি করে রসের সঞ্চার কর্‌তেন—যে জনসাধারণে তা বুঝতে পার্‌তো—সে রসের

আস্বাদ করতো—তার প্রাণে সারা পড়তো। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবির গান সেভাবে অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষিত করতো—যদিও এখনকার মত স্কুলের শিক্ষা ছিল না।”

[৩]

“ইউরোপায় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া সেই কথা গুলিই রসনা দিয়া, বাঙ্গালায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না এই মিথ্যা বৈচিত্র পাশ্চাত্য সভ্যতা সংঘাত জনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্রের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজেকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শতশত অপূর্ণভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাবমোহ, এই ‘বিশ্বমোহ’ যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে নাড়ীচক্রকে ব্যাধি পীড়িত, মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতে হইবে।”

[৪]

“বাঙ্গলা ইউরোপ নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল ইউরোপের সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গালার সাহিত্যের এ রকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনা ও করিতে পারি না। বাঙ্গালা তাহার সুরেও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণ বিকসিত বাঙ্গালা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গালা ও জগৎ ভরপুর হইবে। যদি তাহা না হয়,—যদি বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে, তবে বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি?”

[৫]

"বঙ্কিম ও গিরীশ সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য হইয়াছে। এই দুই মহাকবির সৃষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যে একটা মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক আছে!"

[৬]

"বাঙ্গালার আধুনিক উপন্যাস সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন রিরংসার বিষে, এবং তাহাও আমি বলি ফেরঙ্গ রিরংসা,—বাঙ্গলার তরুণ তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ, তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সত্য হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—'লাখে না মিলিল এক'—একটাও নীলকণ্ঠ আমি বাঙ্গালায় পাইলাম না, এই আমার আক্ষেপ!"

[৭]

"এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে, আজ তাহারই বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সেরূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমি সমস্ত প্রাণ মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই তমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে।—হে বাঙ্গালী, বাঙ্গালার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর—সেই সাধনের পথে—সেই অনুপম কাব্যসৃষ্টির পথে নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও। নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও, তোমার নিজের পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে।"

৮। আধ্যাত্মিকতা—

[১]

"এবার বুঝিয়াছি—কাজের ইন্ধনে প্রাণের আগুন জ্বালাইতে হইবে। ভাবের ধোঁয়া নহে—ভাবের বহ্নি জ্বালাইতে হইবে, তাহা উপায় কেবল কর্ম্ম। দেখুন সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে এমন ক্রি দানে ও ধর্ম্মাচরণে পর্য্যন্ত স্বস্তি পাইতাম না। মনে হইত ফাঁকা সব ফাঁকা। ও সবি মিথ্যা। এবার মনে হইতেছে যেন মু পাইলাম। কাজ চাই, কাজ চাই! স্বামিজীর কথা আপনাদের ম পড়িতেছে না—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

[২]

"এবার কথা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে, নারায়ণের পূজা করিয়া মিথ্যাচা করিব না। এবার নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আমাদের দেশে এই অগণ্য নির্য্যাতিত, অবমানিত, নিরন্ন, দাসত্ব-নিগড়বদ্ধ, দেশ বাসীই আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জাগ্রত নারায়ণের পূ করিব ইহাই আমার কাজ এবং নারায়ণ পূজা। ......ওই যে শিক্ষি অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী, স্ত্রীপুরুষ, বালক-যুবা-বৃদ্ধ, ব্রাহ্ম চণ্ডাল সবাইকে ডাক! ডাক! যাহার যাহা আছে লইয়া আইস আপনার ভার লাঘব কর, ঢাল, ঢাল, এই জীবন যজ্ঞে। নারা যিনি জীবের অয়ণ এবং যিনি নিজেই নরনারায়ণ তাঁহাকে প্রণা করি।"

[৩]

"কেহ কেহ বলেন যে আমরা ধর্ম্ম নিয়ে আছি—রাজনীতি

সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নাই—আবার কেহ কেহ বলেন—আমরা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ধর্ম্ম ও রাজনীতি বুঝি না। বাস্তবিক আমি এঁদের কথার ভাব বুঝি না। জীবনটাকে যে টুকরো টুকরো ক'রে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি ভাগ করা হয়, তা আমাদের দেশীয় ভাব নহে—ওটা একেবারে পাশ্চাত্য ভাব। সব নিয়েই আমাদের জীবন।"

[৪]

"শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে, যখন রাজনীতি বলিয়া পৃথক কোন জিনিষ থাকিবে না। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সকল নীতিই এক হইয়া যাইবে।"

[৫]

"দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, উহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই।"

[৬]

"অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে, বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।"

[৭]

"সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে নিজের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়।"

[৮]

"সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, মুখরিত, বিকসিত সৌন্দর্য্যলীলায় লীলায়িত। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে যে ঘরে ঢুকিয়াছে সেই সে জানে ঘরের কথা।"

[৯]

"আমাদের সকল কর্ম্মের তুমিই কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমিই ধাতা, সকল বিধির তুমিই বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা—হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তুমি এক, তুমিই দুই, এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য।"

[১০]

"ঈশ্বর ঈশ্বর বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ শান্তি ল'তেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন।"

[১১]

"তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্ম্মিক প্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ
ওগো কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর
জীবনে তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্;

উর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।"

[১২]

"ওহে সাধু! আমি জানি অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায়;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে কত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজকি এ মিথ্যা ভরা দেবতার ভাণ।"

[১৩]

"অসার সকল জ্ঞান? ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী!
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহাদেবতার;
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে?
বৃথাবহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার!"

[১৪]

"জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলো-কে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অন্তর্মুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য।"

[১৫]

"নিখিলের প্রাণ তুমি, তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;
জাগরণে কর্ম্ম-ভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্ব্বপ্রাণময় ! তুমি যে আমার !"

[১৬]

"নহ মিথ্যা সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার !
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভরে পরাণে তুলেছি !
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধভরা আত্মার মন্দির !"

[১৭]

"কতজন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
কোন দিন হেরি নাই
কোন দিন পাই নাই
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার !"

[১৮]

"হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময় !
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !

আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা আমারি পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে ;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন !
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন !"

[১৯]

"সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণ মোর করিয়াছি খালি
আরো যে চাহিছ তুমি ! কি দিবগো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূণ্য প্রাণ খানি ।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর ?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !"

[২০]

"যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি আছ তুমি
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাড়াইনু আমি !—
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী !"

[২১]

"সেই যে শিরে মোহন চূড়া,
সেইত হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মূরতি হেরবো বলে
পরাণ বড় অভিলাষী ;

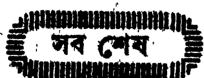
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার।
এস আমার পরশ মাণিক,
বেদ বেদান্তে কায কি আর॥"

[২২]

"সব কর্ম্ম শেষে আজ মন এক তারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশে হারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথ খানি মোর গয়াগঙ্গা কাশী!"

[২৩]

"হে মোর আজন্ম-সখা! কাণ্ডারী আমার!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!!"





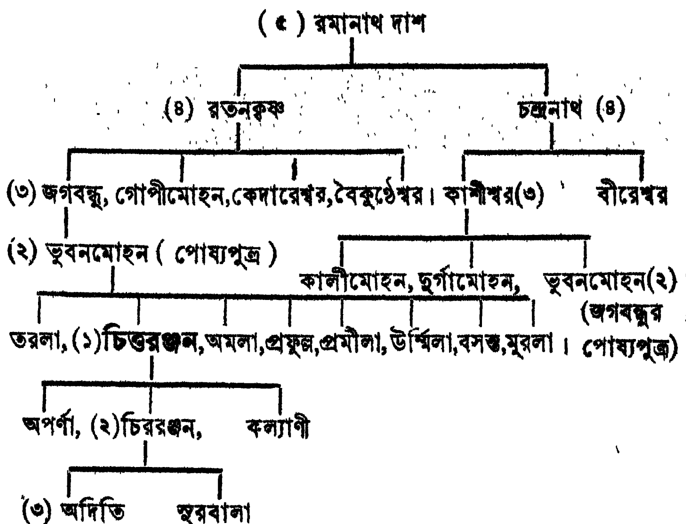
অন্তিমশয্যায় দেশবন্ধু

৫৬ পৃঃ



জীবন-সার

দেশবন্ধুর উর্দ্ধতন ৫ম পুরুষ হইতে অধস্তন ৩য় পুরুষের নাম নির্ঘণ্ট।



আবির্ভাব ১৮৭০ খৃঃ ৫ই নভেম্বর শনিবার।

তিরোভাব ১৯২৫ খৃঃ ১৬ই জুন মঙ্গলবার।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা চির প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর 'আড়িয়াল বিলের' পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র তেলিরবাগ গ্রামই দেশবন্ধুর পিতৃপিতামহ প্রসিদ্ধ বৈদ্য-বংশীয়দের বাসস্থান। বিক্রমপুরের গৌরবের দিনে এই বৈদ্য-বংশের রতনকৃষ্ণ দাশ স্বনামখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগবন্ধু নিরপত্যতা হেতু পিতৃব্য পৌত্রদের ভিতর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভুবনমোহনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহনের জনক কাশীশ্বর অতীব দানশীল, বিদ্যানুরাগী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রচিত সরল ও

শ্রুতিমধুর 'নারায়ণ সেবা' ও 'হরিলুঠের পুঁথি' এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে সাধারণের আদরের জিনিষ। ভুবনমোহন নিজে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন এবং অগ্রজদ্বয় হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা ভাগ্যবতী নিস্তারিনী দেবীর সহিত যথাসময়ে ভুবনমোহনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সপরিবারে পটলডাঙ্গাষ্ট্রীটের বাসাবাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। তিনি নির্ভীক, তেজস্বী, স্বদেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। যৌবনেই অগ্রজদ্বয় সহ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কালীমোহন দাশ পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক্ অপিনিয়ান্' এবং 'বেঙ্গল পাব্‌লিক্ অপিনিয়ান্' নামে দুইখানি সংবাদপত্র সম্পাদনে ভুবনমোহনের বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এ ছাড়া তাঁহার বহু রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি স্পষ্টতম ভাবে প্রস্ফুটিত। পত্নী নিস্তারিনী দেবী সুশিক্ষিতা এবং পতির সকলকর্ম্মে সহায়িনী ছিলেন। পটলডাঙ্গাষ্ট্রীটস্থ বাসা বাড়ীতেই ১৮৭০ খৃঃ ৫ই নভেম্বর শনিবার নিস্তারিনী দেবী তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান ভবিষ্যৎ দেশবন্ধুকে প্রসব করেন। এর বৎসর কয়েক পরেই ভুবন-মোহন ভবানীপুরে উঠিয়া যান। সেখানে ক্রমান্বয়ে ৫।৭ খানা ভারাটে বাড়ীতে বাস করার পর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহন দাশের রসারোডস্থ ভবনে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এই বাড়ী ৺কালীমোহন দাশের পোষ্যপুত্র ৺বসন্তরঞ্জন মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ গর্ভধারিনীকে লিখে দিয়ে যান। মা নিজ পুত্রদ্বয় চিত্তরঞ্জন এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ প্রফুল্লরঞ্জনকে দিয়ে যান। পরে চিত্তরঞ্জন ছোট ভাই প্রফুল্লরঞ্জনের অংশটাও ক্রয় করিয়া বাড়ীখানি নিজস্ব করিয়া লয়েন। নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠতাতের স্মরণার্থে বাড়ীর নাম বরাবর

'কালীমোহন আলয়'ই রাখিয়া দেন। ভবানীপুরে লণ্ডন-মিশনারী স্কুলে চিত্তরঞ্জনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ক্রমে তথা হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এফ্‌ এ, এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি-এ, পাশ করেন।

ইহার পর পিতা তাঁহাকে সিভিলসার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়া দেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। সিভিল্-সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার পরই তাঁহার ভাগ্যসমুদ্রে নূতন তরঙ্গ খেলিয়া উঠে। তখন তিনি বহু রাজনৈতিক সভায় নির্ভীকভাবে ভারতের অভাব অভিযোগ এবং ইংরাজশাসনের দোষ ত্রুটি দেখাইয়া বক্তৃতা করেন এবং ভারতের স্বরাজমন্ত্রের আদিগুরু দাদাভাই নৌরজী পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য-পদপ্রার্থী হইলে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। এ সমস্তের ফলে চিত্তরঞ্জন সিভিলসার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও সুফল প্রাপ্ত হন নাই। ইহাতে তাঁহার ঋণভারাক্রান্ত বৃদ্ধ পিতা এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজন সকলেই দুঃখিত ও হতাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় তেজস্বী চিত্তরঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুন্ন হন নাই। তাঁহার উৎসাহ বরং দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে এক ঘটনা হয় যাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহীত স্বদেশপ্রেমের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। জেমস্ ম্যাক্লীন নামক পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য কোনও বক্তৃতায় ভারত-বাসীকে অন্যায় অভদ্রভাবে গালাগালি দেন। এই দেশবাসীর অপমান জন্মভূমির অপমান তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। তিনি সব ভুলিয়া সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দিগকে লইয়া লণ্ডনে এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া অশিষ্ট ম্যাক্লীনের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ

বক্তৃতার তুমুল সমালোচনার ফলে বিলাতের লিবারেল্ দল এক সভার অধিবেশন করিয়া চিত্তরঞ্জনকে সেই সভায় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহার সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে ভারতনিন্দুক মিথ্যাবাদী ম্যাক্লীনকে জগতের সমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হয় ও তাহার সদস্যপদ ঘুচিয়া যায়। জগত সমক্ষে চিত্তরবি এই উষার কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারীতে মনোনিবেশ করেন। পিতৃকৃত প্রভূত ঋণভার, ছোট ভ্রাতা-ভগ্নিদের শিক্ষার ভার এবং বহু-গোষ্ঠিযুক্ত সংসার পালনের ভার একসঙ্গে সবই তাঁহার ঘারে পড়িল। নূতন ব্যারিষ্টারীর সামান্য আয়ে অন্য সর্ব্ববিধ ব্যয়ই নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু পিতৃ-ঋণ পরিশোধের আশু কোন পন্থা না দেখিয়া এবং উত্তমর্ণদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া পিতাপুত্র দুইজনেই দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাইলেন।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিল। ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার নগাঁও গ্রাম, যাহা এখন পদ্মার বিশাল বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে, সেই গ্রামের বরদানাথ হালদার মহাশয় বিজনীষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, বিশেষতঃ বিক্রমপুরেই পাশাপাশি গ্রামে বাড়ী থাকায় দাশ পরিবারের সহিত এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। উভয় পরিবারের অত্যধিক ঘনিষ্টতার ফলে ৺বরদানাথ হালদারের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তীদেবী প্রাপ্তবয়স্কা হইলে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আদর্শ-চরিত্রা শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। হিন্দু আদর্শ-সতী সহধর্ম্মিনীর যা যা গুণ তৎসমুদয় এই দেবীর চরিত্রে একে একে উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জনের প্রেমরাজ্যের চিরনববসন্ত!

তাঁহার প্রতি কর্ম্মে শক্তি, ধর্ম্মে ধাত্রী, সম্পদে সোহাগিনী, বিপদে সান্ত্বনা-দায়িনী এবং দেশব্রতে সহকর্ম্মিনী ছিলেন।

ভাগ্যোন্নতি সাধনে চিত্তরঞ্জনকে প্রথম বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আইন চর্চ্চায় বিশেষ পারদর্শী হইবার জন্য তিনি শিক্ষার্থীর মত আইন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পরিশ্রম সহকারে উপায়ও করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার আসিল বাঙ্গলার ইতিহাসের এক মহাযুগের প্রারম্ভে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের সুপ্রসিদ্ধ বোমার মামলা উপস্থিত হইল। দেশকর্ম্মী শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী রাজনৈতিক মামলার কবলে পতিত হইলেন। প্রায় মাসছয় মামলা চলিল। সংগৃহীত অর্থ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর দিন কয়েকের পারিশ্রমিকে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহার দ্বারা মামলা চালানো অসম্ভব হইল। তদবস্থায় চিত্তরঞ্জন 'স্বদেশী মামলা' বলিয়া নিজের বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়া নাম মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া সুদীর্ঘ ৮ মাস এই মামলা চালাইতে থাকেন। এই ত্যাগের ফল-স্বরূপ অরবিন্দের মুক্তি হইল এবং আইনে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জয় জয় রব সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। বিপ্লববাদীদের স্বপক্ষে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি উডরফ্ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পর হইতে মামলার পর মামলা আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলিয়া দিল। দৈনিক পারিশ্রমিকের হার হাজার টাকার উপরে উঠিল। অরবিন্দের মামলার পর তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলায় ও পর পর স্বদেশী বয়কট মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কোনও

স্বদেশী মামলায় তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মদেশে ভারতরক্ষা আইনে ধৃত মিঃ মেটার মামলা, চট্টগ্রাম কুতুবাদয়ার আটক আসামীদের মামলা, নাগপুরের হোমরুললীগের সেক্রেটারী মিঃ বৈদ্যের মামলা, ডুমরাঁও রাজ মামলা ইত্যাদি বহু মামলা তাঁহার যশ ও ধন অর্জ্জনের নিদর্শন। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্যারিষ্টারি ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মিউনিশনবোর্ডের মামলার ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

এই প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে মদোন্মত্ত হইয়া তিনি কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাইয়া আবার ঋণশোধের কথা, যাহা কোথাও শোনা যায় নাই—চিত্তরঞ্জনের জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশায়ই তিনি নিরাশ উত্তমর্ণদিগকে ডাকিয়া একে একে লক্ষাধিক টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং ঋণ-ভারাক্রান্ত পিতার বিষণ্ণ বদনে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলেন। এরপর আরম্ভ হয় তাঁর দানযজ্ঞ। তাঁহার সঞ্চয়ের পুটুলিতে ছিল ত্যাগের ভীষণ ঝড়োহাওয়া – তাই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দীনাতুরের সেবা ইত্যাদি লোকহিতকর যে কোন অনুষ্ঠানে তাঁহার মুক্তহস্তে দান ছিল। তাহার দানের পেছনে ঢাক ঢোল বাজিত না, প্রকাশ্যে অপেক্ষা গোপনেই তাঁর দান ছিল যথেষ্ট। নবদ্বীপ অনাথ-আশ্রমে দুই-লক্ষ টাকা দানের কথা নিকট আত্মীয়েরা ও জানিতেন না। একদিন শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে থিয়োসফিকেল্ সোসাইটিতে প্রকাশ করে দেন, তাই সবাই জান্‌তে পায়। বৃদ্ধ উমেশ বিদ্যারত্নের বেদবিদ্যা তাঁহার হৃদয়কোনেই সঞ্চিত থাকতো যদি চিত্তরঞ্জন অনুকুল না হইতেন। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্র ঋণদায়ে বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে চিত্তরঞ্জন সে সব ঋণ শোধ করেন।

ময়মনসিংহের স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস অভাবের দারুণ দংশনে অস্থির হইয়া যখন লিখেছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী !
আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে পরাণে মরি ;
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্ !"—

তখন চিত্তরঞ্জনই তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়াছিলেন। দুর্দ্দিনে নিরাশ্রয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সপরিবারে বহুবৎসর চিত্তরঞ্জনের বিশাল চিত্তেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। অধুনা মহাত্মার মুখে শোনা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের তদন্তে গিয়া নির্যাতিতদের সাহায্যকল্পে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। নিজের ক্ষুদ্র গ্রামটির কথাও তিনি ভুলেন নাই। সেখানে বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে তাঁহার যথোচিত যত্ন ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। চাঁদপুরের বিভ্রাটেও শ্রমিকদের সাহায্য করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-মিশনের নানা সদনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন এবং সাধ্যমত অর্থ সাহায্যাদি করিয়াছিলেন। ভবনীপুরের অনাথ ও আতুর আশ্রমে, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের নূতন গৃহনির্ম্মাণে, বেলগাছিয়া ম্যাডিকেল্ কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বহু দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্যে এবং নানা প্রকারে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁহার দানের তুলনা নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মাসিক বাঁধা খুচ্‌রা দান ছিল দুই হাজার টাকার উপর। তিনি প্রতারককেও অকুণ্ঠচিত্তে দান

করিতেন। একবার কোনও গ্রন্থকার গ্রন্থমুদ্রনের অজুহাতে ক্রমান্বয়ে চারিবারে চারি হাজার টাকা নেওয়ার পর পঞ্চমবারে যখন টাকার জন্য উপস্থিত হন তখনও নিরাপত্তিতে আরও এক হাজার টাকার চেক কাটিবার জন্য খাতাঞ্জিকে চেকবই আনিতে আদেশ করেন। খাতাঞ্জি তাঁহাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়া বলিলেন এই ব্যক্তি চার হাজার টাকা নিয়াছে কিন্তু বই ছাপ্‌বার নামটি নেই। ঠকিয়ে সব টাকা নিচ্ছে ওকে আর টাকা দিয়ে কি হবে? উত্তরে বলিলেন— আমাকে কি ঠকাবে হে, ও নিজেই ঠক্‌ছে। দাও ওর টাকার দরকার আছে বলেই চাইতে এসেছে।—এরূপ মহিমান্বিত দান দেশবন্ধুতেই সম্ভবে!

চিত্তরঞ্জনের দুই কন্যাও এক পুত্র। পিতামাতার অনুপম স্নেহে, যত্নে, শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইয়া যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে যথারীতি বিবাহ দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ে চিরদিনই মহা উদার। উদার ব্রাহ্মসমাজও তাঁহার উদারতার বাধা জন্মায় দেখিয়া তিনি সেই গণ্ডীর বন্ধন সজোরে ছিন্ন করিয়া সুবিশাল হিন্দুধর্ম্মের বুকে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি সাধারণ হিন্দু ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ সংস্কারক। তাই তিনি নিজের পরিবারের ভিতর জীবনে ও কার্য্যে সংস্কার করে গেছেন। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের বক্তৃতা অনেকে মুখে দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু নিজের পরিবারের ভিতর দিয়া তেমন সব কার্য্যে পরিণত করিবার সাধ্য বড় কারো হয়ে উঠে না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের এই ছিল বিশেষত্ব, মনে যাহা ভাবিতেন, মুখে তাহা বলিতেন এবং কাজে তাহা করিতেন। তিনি হিন্দু হইয়াও অসবর্ণ বিবাহের পুরা পক্ষপাতী ছিলেন। বড় মেয়ে শ্রীমতী অপর্ণাদেবীকে কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার রায়ের সহিত

ছেলে শ্রীমান চিররঞ্জন দাশকে কলিকাতা ইটালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত 'সুকুমার সেন মহাশয়ের সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবীর সহিত, এবং শ্রীমতী কল্যাণী দেবীকে স্যার সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীমান ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন। তিনি আগাগোড়াই শ্রীকৃষ্ণভক্ত, কীর্ত্তন-পদাবলিতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে প্রভাবান্বিত। তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন পাবনা হিমায়েৎপুর সৎসঙ্গ আশ্রমের বিশ্বগুরু শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর।

বিদ্যাচর্চ্চায়ও তিনি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সুকবি এবং পরম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সাগর-সঙ্গীত', 'মালাঞ্চ', 'মালা', 'কিশোর-কিশোরী', 'অন্তর্য্যামী' বাঙ্গলা পদ্যসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। তাছাড়া 'নারায়ণ' নামে একখানা মাসিকপত্র বহু বৎসর পরিচালনা করেন। চিত্তরঞ্জনের প্রাণ-মাতানো লেখার ভিতর দিয়া নরনারায়ণের জীবন্ত-ভাব তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবন বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কারের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে এই সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং দেশবাসীর প্রাণে যথার্থ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য চিত্তরঞ্জন নিজের প্রভূত অর্থার্জ্জনের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে স্বরাজের মহাবাণী প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বোম্বাই সহরে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিশেষ

অধিবেশনে এবং দিল্লীতে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের দল সংস্কার-আইনকে ভারতীয়ের ন্যায্য দাবীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিলেন। ইহার পর রাউলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক [illegible] তাঁহার [illegible] মনের চিত্ত-ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৯১৯ [illegible] অমৃতসর কংগ্রেসে প্রাণ-খুলে তিনি সংস্কার-আইন সফল করিবার জন্য সরকারের সহিত সহযোগ করিবার নীতির বিপক্ষে প্রতিবাদ করিলেন। তখন হইতেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ, খদ্দর, চরকা প্রচলন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন ইত্যাদি আন্দোলন সুরু হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের [illegible] সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইলে মহাত্মা গান্ধী পঞ্জাব-অনাচার ও খিলাফতের অবিচারের প্রতিকার মানসে অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ভোটাধিক্যে মহাত্মার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও চিত্তরঞ্জনের অনুমোদিত হয় নাই; কিন্তু ঐ বৎসরের নাগপুর কংগ্রেসে সকলকে বিস্মিত করিয়া তিনি অসহযোগ গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং মহাত্মার প্রস্তাব কংগ্রেস-মণ্ডপে [illegible] করিলেন। নাগপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া চিত্তরঞ্জন সম্রাটতুল্য ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটাইয়া স্বদেশ-সেবক সন্ন্যাসী হইলেন। দেশবাসী তাঁহার এই বিরাট ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া পরম আনন্দ ও শ্রদ্ধা সহকারে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়া নায়কত্বে বরণ করিল। দেশবন্ধু সব ছাড়িয়া চৈতন্যের মত বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে মুক্তির গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতার ফলে বহু ব্যারিষ্টার, উকীল মোক্তার, সরকারী-কর্ম্মচারী অসহযোগ-ব্রত গ্রহণ করিলেন। নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয়-কর্ম্মশালা ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইল। [illegible] মহাত্মার বাক্যকে

[illegible] করিলেন। এইসময় তিনি 'বাংলার-কথা' বলে একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই সাপ্তাহিকে তাঁহার ভিতর দিয়া বাংলার যাহা সত্য মর্ম্মবেদনার কথা ও মর্ম্মের ব্যথা, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সারা বাংলা 'বাংলার-কথা' পাঠ করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনার্থ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিলে সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয়। ঐ দিন কলিকাতার অবস্থা দর্শনে ইউরোপীয়ান-সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। তাহার ফলে বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলার স্বেচ্ছা-সেবক দলকে বেআইনী সাব্যস্ত করিলেন। ইহার পর কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার এক ইস্তাহারে সাধারণ সভা-সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করিলেন। বড়লাট লর্ড রেডিং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া এই নীতি পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এদিকে ২৭শে নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং ২৮শে নভেম্বর বঙ্গীয় খিলাফৎ কমিটি এই সিদ্ধান্ত করেন যে গভর্ণরের আদেশ সম্পূর্ণ বেআইনী ও [illegible] কাজেই যথাপূর্ব্ব [illegible] চালাইতেই হইবে। দেশবন্ধু বাংলার ডিক্টেটার পদে সমাসীন হইয়া নিজেকে ভলান্টিয়ার বলে ঘোষণা করেন এবং সমস্ত বাংলার দশ লক্ষ ভলান্টিয়ার আহ্বান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট [illegible]ই বেআইনী বলে নির্দ্ধারন করেন। ৬ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুর আদেশে খদ্দর প্রচারার্থ বড়বাজারে ভলান্টিয়ার প্রেরিত হয়। প্রথম দলে তাঁহার পুত্র চিররঞ্জন অন্যান্য ভলান্টিয়ার সহ গ্রেপ্তার হন। [illegible] পুরুষ-ভলান্টিয়ারদের সহিত দেশবন্ধু-সহধর্ম্মিনী বাসন্তী দেবী, [illegible] উর্ম্মিলা দেবী ও ভাগিনেয়ী সুনীতি দেবী খদ্দর প্রচারার্থ [illegible] পথে বাহির হইলে তাঁহারাও

গ্রেপ্তার হইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে [illegible] এবং [illegible] সে যাত্রাই মুক্তিলাভ করেন। ১০ই ডিসেম্বর [illegible] দেশবন্ধু নিজে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ গ্রেপ্তার হন এবং এই জানুয়ারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে দেশবন্ধু আমেদাবাদে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি হইয়াছিলেন। সরকারের নিগ্রহে তাহার উপস্থিতি অসম্ভব হইল, কিন্তু তাঁহার লিখিত অভিভাষণ শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। জেল হইতে মুক্তির পর বাঙ্গালী এমন কি সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসে তিনি কাউন্সিল প্রবেশের অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু গৃহীত হয় নাই। তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতিকে লইয়া এক নূতন স্বরাজ্য-দল গঠন করেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধুর চেষ্টায় স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরবর্ত্তী কোকনদ কংগ্রেসে অধিকাংশ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন এবং দেশবন্ধুর চেষ্টায় নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি স্বরাজ্যদলের হাতে আসে। তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব প্রভাবে মন্ত্রিশ্রেণীর অনুগৃহীত প্রতিনিধি একে একে ভোটে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাভূত হন। স্বরাজ্যদলের অমিত প্রভাব দেখিয়া গভর্ণর লর্ড লিটন মন্ত্রিসভা-গঠনের ভারার্পণ করেন। দেশবন্ধু ভূয়া মন্ত্রিত্ব প্রত্যাখ্যান করিলেন, এমনকি ছায়াবাজীর পুতুল-স্বরূপ মন্ত্রিদের বেতন নামঞ্জুর ও ভূয়া কাউন্সিল ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিরোধী [illegible] দিগণও তাঁহার পক্ষে ভোট দিতে লাগিলেন, ক[illegible] পদে [illegible]

হইল। প্রথমবার মন্ত্রিবেতন নাকচ হইল। শেষবার অসুস্থাবস্থায় দেশবন্ধুর পাটনা অবস্থানকালে লর্ড লিটন তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের তদ্বির ও চেষ্টায় পুনঃ মন্ত্রি-নিয়োগ-নীতি গৃহীত করাইয়া এবং নূতন মন্ত্রি নিয়োগ করিয়া মন্ত্রিবেতন মঞ্জুর করাইবারজন্য উঠে পড়ে লাগেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের শত চেষ্টা সত্ত্বেও অসুস্থ দেশবন্ধুর অব্যাহত উপস্থিতি যাদু-মন্ত্রের মত কার্য্য করিল। যাঁহারা পূর্ব্বে মন্ত্রি ছিলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করিতে পারেন না এমন সবও জনমতের পক্ষে ভোট দিয়া সরকারকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিবেতন নামঞ্জুর হওয়ায় বাঙ্গালার দ্বৈত-শাসনের অবসান হইল—দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি সার্থক হইল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রি স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতা মিউনিসিপাল-এ্যাক্ট কার্য্যকর হয়। প্রথম নির্ব্বাচন কালেই দেশবন্ধুর আশ্চর্য্য প্রভাবে কংগ্রেসের স্বরাজ্যদল দ্বারা কর্পোরেশন অধিকৃত হয়। দেশবন্ধু প্রথম মেয়র নিযুক্ত হন। মিঃ হাসান সুহ্রাবর্দ্দিকে ডেপুটি মেয়র ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করেন। সহরের দরিদ্রগণের ব্যথাহরণের এবং সাধারণের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের এবং অধিকতর জল সরবরাহের ব্যবস্থা তাঁহাদের চেষ্টায় অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট করিয়া উভয় জাতির ভিতরকার প্রভেদ তুলিয়া দিয়া পরস্পর সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। শিক্ষায় সম্ভাতায় এবং কর্ম্মবিভাগে তিনি হিন্দুমুসলমান উভয়কে সমভাগী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এইতুল্য দৃষ্টিতেই তিনি হিন্দু হইয়াও মুসলমানদের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিরাজগঞ্জের অধিবেশনে 'গোপীনাথ সাহা' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়

সরকার, ইউরোপীয় সমাজ এবং দেশের [illegible] অতীব ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় অর্ডিন্যান্স আইন নামক অন্যায় বে-আইন জারী করিয়া সরকার এই বে-আইনের অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে কর্পোরেশনের প্রধানকর্তা সুভাষবসু [illegible] বাঙ্গালী যুবককে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিলেন। এই আইন দেশবাসীর অনুমোদিত করাইয়া লইবার জন্য এই জানুয়ারী কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। তখন দেশবন্ধু এত পীড়িত যে ডাক্তারগণ শয্যাত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবন্ধু সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া ট্রেচারে বাহিত হইয়াও কাউন্সিলকক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তদ্দর্শনেই অধিক সংখ্যক ভোটদ্বারা আইন অগ্রাহ্য হইল।

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ দেশবন্ধুর লীলাময় জীবনের একটি প্রসিদ্ধ লীলা। দেশস্থ তরুণ-দলের উপর তাঁহার অপূর্ব প্রভাব স্বর্ণ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী [illegible] ও বিশ্বানন্দ দ্বারা তারকেশ্বরের অত্যাচার নিবারণকল্পে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়া তীব্র আকার ধারণ করিলে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে দেশবন্ধু কংগ্রেসপক্ষ হইতে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেন। তদন্তের পর মে [illegible] দেশবন্ধু সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আহ্বানে আন্দোলন চালাইবার জন্য দেশবাসীর মুক্ত হস্তে দান এবং দলে দলে বাঙ্গলার যুবকগণের কারাবরণ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্যকরণ চিরস্মরণীয়! সত্যাগ্রহ আন্দোলন অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সমভাবেই চলে। এই সময় দেশবন্ধুর সহিত মোহন্ত-[illegible] এক আপোষ চুক্তি হয় ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত হয়, [illegible] সঙ্গে তারকেশ্বর অত্যাচারের কবল হইতে মুক্তি লাভ করে।

দেশের যা প্রাণ সেই পল্লীর সর্ববিধ উন্নতি বিধান [illegible]

বে-আইনে ধৃত [illegible]গণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণ-পোষণ—দরকার [illegible] তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করা। জাতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করা, অসহায় বিধবাগণের জন্য আশ্রম [illegible] নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতা নারীদিগের জন্য আবাসস্থান নির্ম্মাণ করা দেশবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৪খৃঃ [illegible] মাসের প্রথম সপ্তাহকে 'স্বরাজ্য-সপ্তাহ' নাম দিয়া দেশবাসীর নিকট অর্থ সংগ্রহার্থে 'দেশের-ডাক' বলে এক আবেদনপত্র বাহির করেন। সেই ডাকে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তদ্দ্বারা 'স্বরাজ্য-ফণ্ড' গঠন করিয়া, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি মিলিত কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। তাঁহার বড় সাধের কর্ত্তব্যগুলি নিজহাতে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিলেন না—রাখিয়া গেলেন পরবর্ত্তিদের জন্য।

নাগপুর কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিল ইত্যাদিতে সদস্য নির্বাচনে এবং দেশহিতকর নানাকার্য্যে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে বহু টাকা ঋণ করিতে বাধ্য হন। তাছাড়া তাঁহার নিজস্ব ঋণও যথেষ্ট ছিল। এই প্রভূত ঋণ পরিশোধার্থে তিনি তাঁহার শেষ সম্বল রসারোডস্থ 'কালীমোহন [illegible]' খানির জন্য ট্র্যাষ্টি নিযুক্ত করেন। তদনুসারে যথাক্রমে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে 'কালীমোহন—আলয়' দেশের সেবার্থে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে। তাঁর যা কিছু ছিল নিঃশেষে করিয়া স্বহস্তে আহুতি দিয়া গিয়াছেন। ট্র্যাষ্টিগণের চেষ্টায় ও উত্তমর্ণগণের বদান্যতায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মাস-দুইয়ের মধ্যেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এখন কালীমোহন-আলয় [illegible] দেশের দশজনের বলে ব্যবহৃত হইতেছে [illegible] স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী

সীমান্ত হইলেও, জগতে কোন সম্রাটের মৃত্যুতে এমন সম্মান প্রদর্শিত হয় কিনা সন্দেহ। হায় দেশবন্ধু! তুমি সত্য সত্যই দেশের ও দশের প্রাণবন্ধু ছিলে—তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তুমি বড় দুঃখে বলিয়াছিলে,—"জীবন সন্ধ্যায় শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমার শক্তি ও সাধনা যে দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, জাতীয় ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ সময়ে দেশ কি আমা হইতে বঞ্চিত হইবে?" সত্যই কি দেশের ভাগ্যে এত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম কশাঘাত বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন? না—আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবনে এক ছিলে এখন বহু হইয়া প্রতি দেশকর্ম্মীর হৃদয়ে তোমার অক্ষয় শক্তি ও সাধনার তেজ সঞ্চার করিয়া দেশের সঙ্কটে মহাশক্তি দেশকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে—নিশ্চয় করিবে।

—বন্দেমাতরম্—

